শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(শেষ কিস্তি)

১৩

আট বছর পরের কথা । ১৯৭৯ সাল।

সামনে ফাহিমের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা। কঠিন পড়াশুনা দিতে হচ্ছে ওকে। অংক এবং ইংরেজির জন্য সারদের বাসায় যেতে হয় সপ্তাহে তিনদিন। ক্লাস তো আছেই। তবে অংকটাই বেশী ভোগাচ্ছে ফাহিমকে।

বাদল কমার্স নিয়ে পড়ছে। ওরও মোটামুটি যাচ্ছে, ফাহিমের মত দৌড়ে নেই। মিল্টনের সাথে বহুদিন ওদের যোগাযোগ নেই। পঁচাত্তরে মিল্টনের মামা রিটায়ার করে ফরিদপুর চলে গেছেন। মিল্টন ওখানে থেকে পড়ে। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। ফাহিম ও বাদল উত্তর দেয়।

ফাহিম পড়াশুনার ফাঁকে মাঝে মাঝে হারিয়ে যায় অতীতে। পুরাণ দিনের সিনেমার মত সব কিছু ভাসতে থাকে চোখের সামনে।

বাহাত্তরের জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সাবিরা আপার বাবা ওবায়দুল হক আসেন বরিশালে। নাতিকে পেয়ে খুশির অন্ত নেই তাঁর। এক সপ্তাহ পর মেয়ে ও নাতিকে সাথে নিয়ে ফিরে যান নিজ শহর দিনাজপুরে। নাতিকে বড় করবেন, মানুষ করবেন, এই আনন্দে তিনি বিভোর। যাবার সময় বাড়িওয়ালা খলিফা সাহেবের কাছে ঠিকানা রেখে গেলেন। যদি জামাতা পারভেজ ফিরে আসে,সে জন্য। না, পারভেজ ফেরেন নি আর।

ফিরোজ ভাই বাহাত্তরের মাঝামাঝি গ্রামের বাড়িতে যান। উদ্দেশ্য, গ্রামে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করবেন। এক বিকেলে ফাহিম দেখে, আবু চাচা গ্রাম থেকে এসে হাজির। ফিরোজ ভাইয়ের সাথে নিচু স্বরে অনেক কথা বললেন। পরের দিন সকালে ফিরোজ বাবা মজিদ সাহেবকে জানলেন গ্রামে যাবার ইচ্ছার কথা। কারণও বললেন। মজিদ সাহেব তাকালেন স্ত্রীর দিকে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ফাতেমা বেগম বললেন, তোকে যুদ্ধে যেতে দিইনি, ঠিক করিনি; তবে এবার যা, দেশ গড় গিয়ে। প্রায় এক বছর থেকে বৈদারাপুর থেকে ফিরলেন ফিরোজ । ততদিনে বৈদারাপুর স্কুল চলতে শুরু করেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে উনি ছাত্র সংগ্রহ করেছেন। ফিরোজ ছিলেন স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক। বরিশাল ফিরে উনি এলো এল বি’ তে ভর্তি হলেন। পাশ করে শুরু করলেন আইন ব্যবসা।

স্বপনদার বাবা-মা বাড়ি বিক্রি করে ইন্ডিয় চলে গেছে সেই চুয়াত্তরে। যাবার সময় ফাহিমদের বাসায় এসেছিল দেখা করতে।

শিরিন আপার বাবা বাহাত্তরে চলে যান গ্রামে। গ্রামেই মারা যান তিনি তেহাত্তরের ডিসেম্বরে। মৃত্যুর আগে প্রতি সপ্তাহে তিনি আসতেন বরিশালে। শহরের পথে পথে হাঁটতেন। যদি মেয়ে শিরিনের সাথে দেখা হয়ে যায় ? শিরিনের ভাই আজগর মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফেরেননি। বাহাত্তরের এপ্রিল মাসে তার এক মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এসে খবর দেন আজগর আর নেই। একাত্তরের অক্টোবর মাসে যশোরের কাছে এক যুদ্ধে তিনি মারা গেছেন।

কতো কথা মনে পড়ে ফাহিমের। সবকিছু মনে হয় যেন সেদিনের কথা। আবার অনেক কিছু হয়তো ভুলেও যাচ্ছে। কিন্তু রুস্তম রাজাকারকে কিছুতেই ভুলতে পারছে না ফাহিম। সবচেয়ে আশ্চর্য, রুস্তম নাকি এখন উজিরপুরে ফিরে এসেছে। একটা রাজনৈতিক দলের নেতা সে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে কিছুদিন আগে। কেউ তাকে নিয়ে এখন আর আর মাথা ঘামায় না। ওই এলাকার একটি ছেলে ফাহিমের সাথে পড়ে। সেই রুস্তম রাজাকার সম্পর্কে এসব বলেছে।

কলেজ থেকে ফিরে এক বিকেলে ফাহিম একটি চিঠি পায়। তার নামে লেখা। চিঠি খোলে ও ।

প্রিয় ফাহিম,

আমি স্বপন, তোমাদের স্বপনদা। খুব অবাক হচ্ছ, তাই না ? অবাক হবারই কথা। তবে এটা ভেবে নিশ্চয়ই খুব আনন্দ পাচ্ছ যে, আমি বেঁচে আছি। কি, আনন্দ পাচ্ছ না ? আরও আনন্দের সংবাদ

আছে। অনুমান করো তো ! কী ? সংবাদ হল, তোমাদের শিরিন আপাও ভাল আছে । আমরা একত্রে আছি ও ভাল আছি। শুনে হয়তো অবাক হবে, আমাদের সংবাদ তোমাদের কাছে অজানা থাকলেও তোমাদের খোঁজ-খবর তোমাদের অগোচরে আমরা নিতাম।

তোমাকে বরং খুলে বলি। তুমি এবার সম্ভবত ইন্টারমিডিয়েট দেবে। তাই না ? তার মানে তুমি এখন বড় হয়েছ। তোমাকে খোলামেলা অনেক কথা এখন বলা যায় ।

একাত্তরে আমাদের যুদ্ধ যখন শেষ হল, আমরা মুখোমুখি হলাম অন্য যুদ্ধের। দেশ গড়ার যুদ্ধ। দেশের অবকাঠামো গড়তে লেগে গেল পেশাজীবীরা। পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনেও এগিয়ে এলো সবাই। যেমন, ফিরোজ ভাই চলে গেলেন নিজ গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে ।

তুমি হয়তো জানো, পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকাররা আমাদের দু' লাখেরও বেশি নারীকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন করেছে; অনেকে গর্ভ পতি হয়ে পড়ে। এঁদের অনেকেই আর তাঁদের পরিবারের কাছে ফিরে যেতে পারেনি। অনেকে আত্মহত্যা করে, অনেকে আবার বিভিন্ন এনজিও' র মাধ্যমে বিদেশে চলে যায়।

তোমাদের শিরিন আপা ছিল নির্যাতিতদের একজন । তোমরা তো জানো, সে একবার আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। দেশের এই যে দু' লাখ নারী – এঁরা আমাদের কারো না কারো মা-বোন-স্ত্রী। এঁদের সমাজে ফিরিয়ে আনাটা ছিল আমাদের একটা বড় সামাজিক দায়িত্ব, এটা একটা সামাজিক পুনর্গঠন। আমরা অনেকে সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টাও করেছি।

আমি শিরিনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম। ওকে আমি বিয়ে করেছি। বরিশালে সবার মধ্যে থেকে সেটা সম্ভব ছিল না। সেই চেষ্টা করলে ওকে হয়তো বাঁচানোও যেত না। তোমাদের সাথে সম্পর্ক রাখিনি এজন্যেই। তাছাড়া শিরিনের দায়িত্ব নেয়ার আর একটা কারণ হল, আমরা পরস্পরকে পছন্দ করতাম।

এবার অন্য কথায় আসি। আমি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এজি অফিসের ছোট একটা চাকরীতে ঢুকেছি বেশ কয়েক বছর আগে। সম্প্রতি অফিস থেকে মাথা গুঁজবার মত একটা বাসাও পেয়েছি। শিরিন ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে একটা প্রাইমারি স্কুলে ঢুকেছে।

আমাদের একটি মাত্র সন্তান, ওর নাম রেখেছি আগুন। ও এবার টু' তে পড়ে। চেষ্টা করছি, আগুন যেন ভাল মানুষদের একজন হতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিশ্চয়ই মিশে থাকবে ওর মননে।

ফাহিম, নিচে আমাদের ঠিকানা দিলাম। ঢাকায় এলে নিশ্চয়ই বাসায় আসবে।

ইতি-

স্বপনদা

ফাহিম চিঠিটা তিনবার পড়ল। একটি পবিত্র ভাল লাগা ওর বুকের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকল। বাদলকেও দেখল চিঠিটা। মিল্টনকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেয়া হল, স্বপনদা ও শিরিন আপার কথা।

এইচ এস সি পরীক্ষা শেষ হলে ফাহিম ঢাকায় বেড়াতে গেল। স্বপনদা-শিরিন আপাদের বাসায়ও গেল। পুরো দু' টো দিন বেড়াতে হল সেখানে। ভালবাসার জোর-অনুরোধ কি এড়ানো যায় ? সেই

শুরু, এরপর থেকে প্রতি বছর ফাহিম যায় উনাদের বাসায়। উনাদের বাসায় গেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় আগুন, স্বপনদা-শিরিন আপাদের একমাত্র সন্তান আগুন।

আগুন পড়াশোনায় খুবই ভাল। সুন্দর ছবি আঁকে সে, চমৎকার আবৃত্তি করে। শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' কবিতাটি একদিন আবৃত্তি করে শোনালো । এত ভাল আবৃত্তি খুব কমই শোনা যায়।

আরও কয়েকবছর পরের কথা। ফাহিম একদিন আগুনকে জিজ্ঞেস করল, আগুন, বড় হয়ে তুমি কী হবে ?

-রাজনীতিক।

এরকম উত্তর শুনে ফাহিম একটু বিস্মিত হয়। রাজনীতিক হবার কথা কোন বাচ্চার থেকে এই প্রথম শোনে সে। কৌতূহল নিয়ে আবার জিজ্ঞেস করে, কেন, কেন তুমি রাজনীতিক হতে চাও ?

একটু চিন্তা করে আগুন বলল, আমাদের দেশটা সদ্য স্বাধীন হয়েছে। একে গড়ে তুলতে হবে। একজন ভাল রাজনীতিকই পারে এই কাজটা ভাল ভাবে করতে। উত্তর শুনে আবারও অবাক হল ফাহিম। ওই বয়সে এরকম কথা সত্যি আশা করা যায় না।

আগুন দেখতে-শুনতে অন্য রকম হয়েছে। ঠিক বাবা-মা' র মত না। হঠাৎ বিদ্যুতের মত অন্যরকম একটা চিন্তা ফাহিমের মধ্যে খেলে গেল। আচ্ছা, আগুন উনাদের সন্তান তো ? কেন দীর্ঘসময় স্বপনদা-শিরিন আপারা বরিশালের সাথে যোগাযোগ রাখেনি ? ফাহিম তার ভাবনাকে আর প্রসারিত হতে দিল না। ফাহিম বিশ্বাস করে, মানুষের পরিচয় তার কর্মে, অবশ্যই তার জন্মে নয়।

সময় প্রবহমান। আমাদের চেনা পৃথিবীতে কত কিছুই না ঘটে। সময়ের ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে।

১৪

১৯৯২ সালের ২৬ মার্চ ।

দু' টো কারণে এই দিনটি বাঙালির জীবনে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত: ২৬ মার্চ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস। দ্বিতীয়ত: এই দিন শহিদ জননী জাহানারা ইমাম এর নেতৃত্বে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এক গণআদালতের মাধ্যমে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে। প্রতীকী বিচার। আদালত বসবে সরওয়ার্দী উদ্যানে। গত কয়েকদিন ধরে ছাত্র-জনতার মধ্যে এর প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, জাহানারা ইমামের বড় ছেলে রুমি মুক্তিযুদ্ধের সময় শহিদ হন।

কিন্তু নির্বাচিত সরকার গণআদালতের বিচারের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সরকার সরওয়ার্দীতে কোন ভাবে এই বিচার হতে দেবে না। কিন্তু জাহানারা ইমাম অনড়। তাঁর সাথে ঢাকা শহরের সমস্ত ছাত্র-জনতা যেন একত্র ।

সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্র-জনতার খন্ড খন্ড মিছিল সরওয়ার্দী উদ্যানে এসে মিশছে। দেখতে দেখতে সমস্ত এলাকাটি লক্ষ লক্ষ মানুষে ভরে গেল। তারপরও মানুষ আসছে তো আসছেই।

ফাহিম সকালে ঢাকায় এসেছে, বরিশাল থেকে। পল্টনে ফুপুর বাসায় উঠেছে। সকালের নাস্তা সেরে দৈনিক বাংলার মোড়ে এসে দাঁড়াল সে। যাবে সরওয়ার্দী উদ্যানে। তাকিয়ে দেখল, ফকিরাপুলের দিক থেকে একটা মিছিল আসছে।

স্লোগানে প্রকম্পিত করে মিছিলটি এগিয়ে যাচ্ছে সরওয়ার্দীর দিকে। মিছিলের সামনে আগুন। স্লোগান দিচ্ছে সেই। ‘ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই, করতে হবে, করতে হবে’ । মিছিলের দ্বিতীয় সারিতে স্বপনদা ও শিরিন আপাকে দেখতে পেল ফাহিম। মুখে তাঁদের স্লোগান।

জোরে পা চালিয়ে মিছিলে নেমে গেল ফাহিম।

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক